আমার বার্তালাপ

মার্চ, ২০২২

বিশ্বভারতী এমন একটি শক্তিময়ী নদী যা অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার স্বতন্ত্র প্রবাহের গতিচিহ্ন অব্যাহত রেখে চলেছে। এটি একটি নদী, কারণ এটি ১৯২১ সালে ভারতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এটি একটি শক্তিময়ী নদী যেহেতু এটির সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে কোনো অশুভ শক্তিই এর প্রবাহ বন্ধ করতে পারেনি। যদিও কিছু অপশক্তি তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর প্রবাহ বা গতিমুখ পরিবর্তনের জোরপূর্বক চেষ্টা করেছে অনেকবার। যাই হোক, গুরুদেবের আশীর্বাদে, তাদের কেউই সম্ভবত সফল হতে পারেনি, কারণ ইতিহাস আমাদের বলে যে সাধারণত অশুভ শক্তি হয় প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল। যাঁরা সর্বদা— সজাগতা, সযত্নতা ও সহানুভূতি;—গুরুদেবের রাজনৈতিক-মতাদর্শের এই মূল মূল্যবোধগুলিকে অগ্রাধিকার দেয় তাঁদের সঙ্গে এইখানেই অপশক্তিগুলির বৈপরীত্য। অশুভ শক্তিগুলি নানা বিচিত্র তরঙ্গ তোলে, যা আসলে বড় বড় বুদবুদ; এবং যা আপনা থেকেই ফেটে যায় কারণ প্রকৃতি তাদের চিরকাল সহ্য করে না।

তবে কারোর ধরে নেওয়া উচিত নয় যে গুরুদেব স্বয়ং হয়রানি ও অপমানের হাত থেকে মুক্ত ছিলেন। অনেক সময়ে তিনি বিচলিতও হয়েছিলেন; যদিও তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক-মতাদর্শগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগুলো কেবলই এক-একটি বাধা যা তাঁর দৃঢ় সংকল্পকে কখনোই ব্যাহত করতে পারবে না। উদাহরণ প্রচুর। তাঁর *চারিত্রপূজায়*, তিনি অকপটে বলেছিলেন, কীভাবে বাঙালিরা অন্যদের নীচে টেনে নামাবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে থাকে। তাতে তাদের লাভ না হোক, অন্যের ক্ষতিসাধনে তারা অন্তত তৃপ্তি লাভ করে! সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় ('কর্মী রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে প্রকাশিত ১৯৩৭) অন্যদের সমস্যায় ফেলার ক্ষেত্রে বাঙালির স্বভাবগত প্রবণতা সম্পর্কে তিনি কী উপলব্ধি করেছিলেন তা বলেছিলেন। এটিই ছিল, তাঁর মতে, সম্প্রদায় হিসেবে বাঙালিজাতির পতনের কারণ। তবুও, কবি কখনোই তাঁর সংকল্প থেকে সরে আসেননি এবং তাঁর লক্ষ্যের প্রতি চিরকাল তিনি অবিচলই ছিলেন।

গুরুদেবের কঠোর পরিশ্রম একটি বিকল্প বিদ্যাচর্চা এবং শিক্ষাপদ্ধতির কেন্দ্র তৈরির দিকে পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং, বিশ্বভারতী একটি জীবন্ত ইতিহাস এবং একটি জীবন্ত দর্শনও। এটির একটি সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের ইতিহাস রয়েছে যা ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উন্মোচিত হতে শুরু করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র রূপ হিসাবে বিশ্বভারতী ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সচেষ্ট ছিল যা শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং শিক্ষার অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি যা সত্যিকারের মানবিক চেতনা জাগরণে সহায়ক হতে পারে তার কথাও ভেবেছিল। তাই, কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মানুষকে সংযুক্ত করার জন্য অনেক উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, বুধবারের নিয়মিত উপাসনা শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়নি, বরং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য নির্বিশেষে মানুষকে একত্রিত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। একইভাবে, অন্যান্য নিয়মিত অনুষ্ঠান যেমন পৌষ-উৎসব, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, বৈতালিক। এই পার্বণগুলির সামাজিক উদ্দেশ্য রয়েছে। এইজাতীয় অনুষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা একে অপরের সঙ্গে; এবং ক্যাম্পাসের

আশেপাশের গ্রামের সঙ্গে এইভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। এটিও একটি বিরল পদক্ষেপ যা গুরুদেব করেছিলেন কারণ তিনি সর্বদা বিশ্বাস করতেন যে চারপাশের মানুষের সঙ্গে আশ্রমিকদের বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। এই কারণেই গুরুদেব এবং তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বদা মেলা বা মেলা আয়োজন করতে আগ্রহী ছিলেন। এই মেলা ছিল এমন একটি উপলক্ষ যেখানে লোকেরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক উচ্চনীচ ভেদ ভুলে একে অপরের সঙ্গে মিশতে পারত। যারা মেলায় আনন্দের জন্য আসে তারা তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান নির্বিশেষে একে অপরের সাথে মিশে যায়।

সূচনাকাল থেকে বিশ্বভারতীর ইতিহাসের গতিমুখ বিশ্লেষণ করলে এটাকে একটা ধাক্কা এবং মোহভঙ্গের কারণ মনে হবে যে বিশ্বভারতী এত দ্রুত অধঃপতিত হয়েছে! রবীন্দ্রনাথ এই স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধঃপতনের বেশিরভাগ কারণ আগেই আন্দাজ করে গিয়েছিলেন। অন্যথায়, তিনি গান্ধীকে লেখা তাঁর চিঠিতে লিখতেন না যে বিশ্বভারতী ‘একটি তেমন জাহাজ যা [তাঁর] জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি বহন করে চলেছে ... এটি রক্ষা করার জন্য স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিশেষ প্রযত্ন দাবি করা অন্যায্য নয়।’ (গান্ধীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০)। উত্তরে, মহাত্মা লিখেছিলেন যে ‘আপনি আমার হাতে যে মর্মস্পর্শী চিঠি তুলে দিয়েছেন--- [তা] আমার হৃদয়স্পর্শ করেছে [কারণ] বিশ্বভারতী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান; এটা নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক। এটার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার সাধারণ প্রচেষ্টায় আপনি আমার উপর যথাসাধ্য নির্ভর করতে পারেন।’ (রবীন্দ্রনাথের প্রতি গান্ধী , ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০)। নিজের লক্ষ্যসাধনের প্রতি কবি এতটাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে তাঁর নাচ ও গানের দলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত পরিক্রমা করেছিলেন। কবির বয়স যখন সত্তরের ঘরের প্রথম দিকে, তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য অনেক প্রোগ্রামে অভিনয় করেছিলেন যা গান্ধীকে বিব্রত করেছিল। গুরুদেবকে লেখা তাঁর চিঠিতে এটি স্পষ্ট হয়েছিল, যখন মহাত্মা এই বলে তার যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিলেন যে ‘এটা অকল্পনীয় যে আপনার বয়সে আপনাকে আবারও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হচ্ছে। শান্তিনিকেতন থেকে বের না হয়েই প্রয়োজনীয় তহবিল আপনার কাছে যাতে পৌঁছোয় সে ব্যবস্থা করা হবে।’(রবীন্দ্রনাথকে গান্ধী, ১৩ অক্টোবর, ১৯৩৫)। এর থেকে যা বোঝা যায় তা হল তাঁর ‘সৃষ্টি’ বিশ্বভারতীর জন্য কবি কতটা আন্তরিকভাবে কাতর ছিলেন! তাঁর হৃদয়-উথলানো উদ্বেগ ছিল বিশ্বভারতীর জন্য যা, তাঁর মতে, এমন একটি জায়গা যেখানে সমগ্র বিশ্ব একটি নীড়ে এসে মিলিত হয়েছে (‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্’)। বিশ্বভারতী হল সর্বজনীন মানবসম্পদের ক্ষেত্র। তাঁর ধারণার কেন্দ্রস্থলে মানবতার জন্য যে ব্যাকুলতা তার থেকে যদি সে সরে যায় তাহলে তার যাবতীয় সম্ভাবনাও হারায়। তাই, তিনি, তাঁর রচিত গ্রন্থে সর্বজনীন মানবতাবাদে আগ্রহ সৃষ্টির পক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। এটি তাঁর রাজনৈতিক-মতাদর্শগত বিশ্বাসের মূল।

১৯১৩ সালে গুরুদেবের নোবেল পুরস্কার জয় কীভাবে শান্তিনিকেতনকে একটি ঘুমন্ত জনপদ থেকে একটি প্রাণবন্ত নগরীতে রূপান্তরিত করেছিল তা দেখানোর জন্য আমাকে এখানে একটু সতর্কভাবে দুয়েক কথা যোগ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বভারতী উদ্যোগের বিকাশের ফলে একদল লোকের কাছে এটি হয়ে উঠেছিল তাদের আয়ের উৎস। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন একটি পরিবার শান্তিনিকেতনের আশেপাশের জমি বিক্রয় করে প্রচুর উপার্জন করেছিল যা ছিল প্রধানত ধানের জমি। যেহেতু জমির দাম সস্তা ছিল, এই পরিবারটি সেকারণে প্রচুর পরিমাণে জমি কিনেছিল; কারণ গুরুদেব সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ের পরে বিশ্বকবি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে এখানকার জমির দাম বাড়তে থাকে। পরিবারটির একটি পাকাপোক্ত হিসাব ছিল যে কবির নোবেল পুরস্কার

পাওয়ার পর এবং ইউরোপ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ধনী ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতনে জমি কিনতে এবং বাড়ি তৈরি করতে চাইবেই। জায়গাটা হঠাৎ করেই কারোর কারোর কাছে সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকে উচ্চাসন প্রতিষ্ঠার সূচক হয়ে উঠেছিল। সহজ কথায়, কলকাতার অভিজাতদের এখানে জমি কেনার ব্যাপারটা ভূমিগতভাবে নোবেল বিজয়ীর নৈকট্যে থাকার সুবাদে সামাজিক সম্মান-অর্জনের একটি প্রচেষ্টার প্রতিফলন বলা যায়। একটি সাবেক জনপদ এভাবেই হঠাৎ করে বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যে পরিবারটি সুলভ মূল্যে জমি কিনেছিল এবং সাধারণ কৃষকদের একভাবে বোকা বানিয়েছিল তারা রাতারাতি যথেষ্ট ধনী হয়ে গেছে।

গুরুদেবের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি

১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৫১ সালে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা 'একটি জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান' হিসাবে এর রূপান্তরের অন্তর্বর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্যক্তিগত আকচা-আকচির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। গুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। রথীন্দ্রনাথকে প্রথম উপাচার্য করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি ভাবনা ছিল এই যে, অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তিনি সক্ষম হবেন। যদিও তিনি বুঝতে পারেননি যে তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে বিশ্বভারতী চালানো ছিল একেবারে আলাদারকম পাটোয়ারি খেলা ও মোকাবিলার নামান্তর; কারণ যাঁরা কবির সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরাও নিজেদের রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতে থাকেন। যখন তাঁদের কাউকেই শীর্ষ পদ দেওয়া হল না, তখন সেইসব 'অতৃপ্ত আত্মা'রা একত্রিত হয়ে রথীন্দ্রনাথের জীবনকে ভয়ানক কঠিন ও দুর্বিষহ করে তোলেন। ভারতের স্বাধীনতার লাভের পর পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে ওঠে; কারণ আগে বিশ্বভারতীর সঙ্গে আবেগগতভাবে যুক্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে ছিন্নভূমি একটি নতুন রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভাঙাদেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ভারাক্রান্ত সেইসব নেতারা তখন বিশ্বভারতীতে কী ঘটছিল সেদিকে খুব একটা মনোযোগ দেননি। রথীন্দ্রনাথ সম্ভবত তাঁর পিতার সময়ের বিশ্বস্ত সহকর্মীদের বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁরা যে তাঁর কতবড়ো ক্ষতি করতে পারেন তা তিনি আন্দাজও করতে পারেননি। তাঁর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আর্থিক আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগই নয়, নৈতিক স্খলনের কলঙ্কও লেপন করা হয়। তিনি ক্রমশ একজন নিঃসঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠেন, এবং জাতীয় গুরুত্বের এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা অধিষ্ঠিত সেই দিল্লির কর্তাদের সমর্থন পেয়েছিলেন বলেও মনে হয় না। কোনো সাহায্য পাওয়ার আশাও ছিল না। তখন এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যখন বিশ্বভারতী ছেড়ে দেরাদুনে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় ছিল না। সেখানেই ১৯৬১ সালে তিনি মারা যান। সম্প্রতি, ঔপন্যাসিক শ্রীনবকুমার বসু রথীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীন একাকিত্বের যন্ত্রণা ও বেদনার কাহিনী চিত্রিত করেছেন (নবকুমার বসু, *তোমার আলো তোমার আঁধার,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৭)। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, রথীন্দ্রনাথ তাঁদের ব্যক্তিগত বিরোধের শিকার হয়েছিলেন যাঁরা তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নিতে স্পষ্টতই ঈর্ষান্বিত ছিলেন। যে পরিবার সস্তায় কেনা জমি বিক্রি করে সম্পদের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, সেই পরিবারটি ছিল বিশিষ্ট পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম যারা এত নীচে নেমে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রচারণা চালায় যা বর্ণনারও বাইরে। সেই পরিবারটি ছিল এখানকার প্রথম পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম যেটি আর্থিকভাবে উন্নতি লাভ করেছিল— এখনকার ভাষায় যাকে বলে প্রোমোটারি ব্যবসা করে।

প্রাক্তন উপাচার্যদের স্মৃতিকথাগুলি পর্যালোচনা করলে এটা নিশ্চিত হয় যে রথীন্দ্রনাথ কীভাবে আশ্রমিক, তথাকথিত রাবীন্দ্রিক, স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, জমিহাঙর এবং সেই শিক্ষকদের সহ অনেক 'অতৃপ্ত আত্মা'র সমন্বয়ে গঠিত শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এইসব 'অতৃপ্ত আত্মা' বিশৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকতে ভালোবাসেন কারণ সম্ভবত তাঁরা তাঁদের লেখাপড়ার কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু যে বিশ্বভারতীকে 'ভগ্ননীড়' হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পরে, অধ্যাপক রজত রায়, *দেশ* (১৭ আগস্ট, ২০১৯)-এ একটি দীর্ঘ লেখায় তাঁর পূর্বসূরিরা যে উদ্বেগগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন তার কিছু কিছু প্রতিধ্বনিত করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বভারতীর পতন হল (ক) স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থের বন্যবিস্তারের পারম্পর্য। এমনকি মহান বিজ্ঞানী, প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন বোস নাকি বলেছিলেন যে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল কারণ অনেক ছুরির এখানে একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল যে শান্তিনিকেতনের মতো এত ছোটো একটা জায়গায় এতগুলো খারাপ লোকের পক্ষে কীভাবে একত্র সমাবেশ সম্ভব হতে পারে! অধ্যাপক রায় *দেশ* পত্রিকার ওই প্রবন্ধে আরও যোগ করেছেন যে বিশ্বভারতী হল 'বোলপুর ভারতী' এবং 'শান্তিনিকেতন শান্তির আবাসস্থল না হয়ে, হয়ে উঠেছে অশান্তির নিকেতন' | শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের ধারাবাহিকতার কারণে এই অভিযোগের সত্যতা রয়েছে বলেই মনে হয়। তিনি সঠিক বলেছিলেন যে এই ধরনের কাজকর্মের ইচ্ছাকৃত ধারাবাহিকতা বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক চরিত্র; এমনকি তার জাতীয় ভাবমূর্তিকেও ক্ষুণ্ন করে; যা বিশ্বভারতীর মূল ভাবনার (যেখানে বিশ্ব এসে একনীড়ে মিলিত হয়েছে) বিপরীত। আমার কার্যকালে আমি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে পরিণত করা যায়।

রবীন্দ্র ভবন থেকে গুরুদেবের নোবেল পদক চুরি হওয়ার সময় তথাকথিত স্টেকহোল্ডারদের কেউই লজ্জিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। ২০২১ সালে সংগীত ভবন থেকে মডারেশনের পর প্রশ্নপত্র চুরি যাওয়ার বিষয়টি কখনোই কারোর উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে না! একজন প্রাক্তন উপাচার্য (অধ্যাপক দিলীপ সিনহা)-কে যখন একজন অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার জন্য জেলে পাঠানো হয়েছিল তখন তারজন্য কেউ বিষোদ্‌গার করেননি; কিংবা অন্য একজন প্রাক্তন উপাচার্য (অধ্যাপক সুশান্ত দত্তগুপ্ত) অনেক বেআইনি নিয়োগ করার জন্য এবং নতুন নিয়োগকারীদের প্রতি অযৌক্তিক অনুগ্রহ করার জন্য এখন নিয়মিত সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) আদালতে উপস্থিত হলে কেউ বিচলিত বোধ করেন না!

বিশ্বভারতীর অধঃপতন অত্যন্ত তীব্র এবং দৃশ্যমান যা সারা দেশে নৈতিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সততার অবক্ষয়েরই একটি রূপ। ফলস্বরূপ, বিশ্বভারতীকে নীচে টেনে নামাবার জন্য স্টেকহোল্ডারদের লালিত কিছু মূল্যবোধ শিক্ষার্থীরা আত্মসাৎ করবে তা বিস্ময়কর বলে মনে হয় না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওইসব 'অতৃপ্ত আত্মা'দের (শিক্ষক এবং অন্যান্যদের) প্ররোচনা ছাড়া ছাত্ররা এতটা বেপথু হতে পারত না যে তারা তাদের মানবতাবোধ সম্পূর্ণ বিকিয়ে ফেলবে! এটা স্পষ্ট হয়েছিল যখন আমি আমার দুই সন্তানসহ ২০২১ সালে এগারো দিনের জন্য ঘেরাও হয়েছিলাম। তারা দৈনিক বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আমাদের বন্দিত্বের সেই দিনগুলিতে সচেতনভাবে জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ভাবি, এই কি রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য! বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত সবাই তাদের মানবতা হারিয়ে ফেলেছে তা নিশ্চিত হয়েছিলাম যখন আমাদের এগারো দিনের বন্দিত্বের সময় দেখলাম বিশ্বভারতীতে করেকম্মে খাওয়া কেউই উপাচার্যকে মুক্ত করতে এগিয়ে এল না! ক্যাম্পাসে কর্মকর্তারা

কক্ষ বা ভবনের ভিতরে থাকলে অফিসের দরজায় তালা দেওয়ার একটি সাধারণ অভ্যাস এখানে রয়েছে। এটা তথাকথিত ছাত্র এবং তাদের বন্ধুদের মিলিত গুন্ডামি। প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদালতই উদ্ধারকর্তা হিসেবে এসময়ে কাজ করেছে। বিশ্বভারতীতে আইন বা নিয়ম হল বোকাদের জন্য আর 'জোর যার মুলুক তার' হল বাস্তব। যদি একজন উপাচার্য এবং তাঁর সহযোগীরা এই গুন্ডামির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, অন্যপক্ষের প্রশ্রয়ে তাঁর উপর মৌখিক এবং শারীরিক উভয় ধরনের আক্রমণের বাণ নেমে আসবেই। যদি উপাচার্যকে না পাওয়া যায়, তাহলে কর্মসচিব এবং তাঁর অফিসের সহকর্মীরা আক্রান্ত হবেন; যেমনটা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের ঘটনাটিতে ঘটেছিল। অফিসে বেআইনিভাবে আবদ্ধ থাকার কারণে, শিবরাত্রির দিন কর্মসচিবকে, এমনকি তাঁর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করার অনুমতিও দেওয়া হয়নি; এবং তাঁর সহকর্মী, একজন যুগ্ম কর্মসচিব যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে চিকিৎসা সেবার সুযোগও দেওয়া হয়নি। এর মধ্যে কি মানবতার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়— যার জন্য গুরুদেব তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন? আমি অবাক। এর মানে কি এই যে গুরুদেব তাদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার একটা উপায়মাত্র? তাদের স্বার্থে বাধা পড়লেই তারা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের 'রাবীন্দ্রিক' বলে জাহির করতে সংকোচ বোধ করেন না। 'রাবীন্দ্রিকতা'র দাবি আসলে তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের ছল ছাড়া কিছু নয়।

মানুষকে একত্রিত করা

সার্বজনীন মানবতাবাদে বিশ্বাসী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করতে যাতে মানুষ সমবেত হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবতার পক্ষে প্রতিকূল বেশিরভাগ সমস্যা সহজেই একতাবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করা সম্ভব। এইজন্য তিনি সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য অনেক উৎসব ও পার্বণ তৈরি করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, উদাহরণস্বরূপ, প্রতি বুধবার কাচমন্দির বা উপাসনা গৃহের নিয়মিত উপাসনা। বিশ্বভারতী বছরে উনচল্লিশটি উপাসনা করে। মন্দিরের উপাসনায় উপস্থিতির স্বল্পতা লক্ষ করলে মনে তীব্র বেদনা জন্মায়। আমি ভাবছি, তথাকথিত রাবীন্দ্রিকরা এতে কুমিরের কান্না কাঁদবে কি না! একইভাবে বৈতালিকে, যা সংখ্যায় মাত্র পাঁচ, তাতেও উপস্থিতির হার এতই কম যে বিশ্বভারতীর রাবীন্দ্রিক এবং এখানকার অন্নে প্রতিপালিতরা এব্যাপারে কতটা আগ্রহী তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। বিশ্বভারতীতে এটি আদপেই বিচিত্র নয় কারণ একজন স্বঘোষিত রাবীন্দ্রিক হওয়া হল এখানকার আর্থিক এবং অন্যান্য সম্মান লাভের একটি উপায়। তথাকথিত আশ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য যাঁরা আজকের বিশ্বভারতীর কল্যাণে খুব কমই অবদান রাখেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি এককালীন তহবিল(কর্পাস ফান্ড) গঠন করে আর্থিক অনুদানের জন্য তাঁদের কাছে গিয়েছিলাম যা এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও এখানে আগে ছিল না। হতাশার কথা হল, তাঁদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই আসেনি, যার অর্থ হল তাঁরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে মাথায় করে রাখেন ততক্ষণ, যতক্ষণ তাঁদের পক্ষপাতদুষ্ট মুনাফা সমূহ সুরক্ষিত থাকে! অন্যথায় তাঁরা তাঁদের বিস্ময়কররকম নিম্নস্তরের মানসিকতা প্রদর্শন করতে এবং দ্বিধাহীনভাবে তাঁদের বিষদাঁত প্রদর্শন করতে পিছপা হন না।

শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ কেউ এই গোলকধাঁধায় আটকা পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ক্যাম্পাসে এই ধরনের হতাশাজনক পরিবেশ তৈরি এবং তাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের দুঃখজনক অবদানের কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা সর্বদা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করতে থাকেন। সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় হল যে তাঁরা ছাত্রদের অন্যায্য দাবিতে জেদ ধরে রাখতে ও প্ররোচিত করতেও আপত্তি করেন না। এটি তাঁদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যপূরণের জন্য অন্যদের ব্যবহার করার একটি

পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এখানে আমি অবশ্যই জার্মান কবি মার্টিন নিমোলার (১৮৯২-১৯৮৪) বিখ্যাত একটি কবিতার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কবি লিখেছেন:

‘প্রথমত, তারা সমাজতন্ত্রীদের খোঁজে এসেছিল, এবং আমি কথা বলিনি—
কারণ আমি সমাজতন্ত্রী ছিলাম না।
তারপর তারা ট্রেড ইউনিয়নের লোকেদের খোঁজে এসেছিল, এবং আমি কথা বলিনি—
কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়নবাদী ছিলাম না
তারপর তারা ইহুদিদের জন্য এসেছিল, এবং আমি কথা বলিনি—
কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না
তারপর তারা আমার খোঁজে এসেছিল—এবং আমার হয়ে কথা বলার জন্য তখন কেউ আর অবশিষ্ট ছিল না।’

যাদের কোনো মানবিক উদ্বেগ নেই এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহৎ উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তাদের সমর্থন করে বিশ্বভারতী শিক্ষকদের ক্ষুব্ধ সদস্যরা একটি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরিতে জড়িয়ে পড়ছেন বলে মনে হচ্ছে যা এখনই বা অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে; এবং অপরিসীম যন্ত্রণার কারণ হবে। এটি একটি ইতিহাসসিদ্ধ সত্য। ইতিহাসের অনেক দৈত্য হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যখন তারা মানবতা; এবং মানবিক সেইসব মূল্যবোধ যা প্রতিকূলতার মধ্যেও মানবতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে তার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের একটি ফলাফল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া ঘটনাগুলির মধ্যে স্পষ্ট। বিশ্বভারতীর তথাকথিত ছাত্রদের সংঘটিত অশান্তি এতটাই নীচে নেমে গেছে যে এটি বিশ্বভারতীর প্রকৃত উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের হৃদয়-যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছে। যারা ২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রহরী পরিবর্তনের পর থেকে তাদের আধিপত্য হারিয়েছিল, তারা অবশ্য কর্তৃপক্ষের হেনস্থা হওয়ার পরে আনন্দই করেছিল। আমি তাদের নিমোলারের উপরোক্ত কবিতাটি মনে করিয়ে দিই। ইতিহাস হল ন্যায্য বিচারক এবং সে কাউকে রেয়াত করে না। তাদের আর্থিক সুবিধা এবং তাদের আপাত উচ্চ সামাজিক ঠাটবাট তারা ভোগ করেছে গুরুদেবের অলোকসামান্য সৃষ্টিকে বস্তুগত লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। ভবিষ্যতের সামাজিক-মতাদর্শগত হিমপ্রবাহের মুখে এই কৌশল কিন্তু পর্যাপ্ত নাও হতে পারে! বিশ্বভারতীকে একটি উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে থামানোর জন্য এবং ঘৃণ্য পরিকল্পনা রচনা করার জন্য ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। অতীতে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তাব্যক্তিও তাঁদের কার্যকালের সময় এইজাতীয় কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলার জন্য শিক্ষার্থীদের দায়ী করা সহজ। এটি অবশ্য একরকম সরলীকরণ যে তাদের কৃতকর্মের জন্য তারাই শুধু অপরাধী। একজনের আচরণ বা খারাপ ব্যবহার প্রথমত পরিবারের যথাযথ সামাজিকীকরণের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। ভারতীয় সংস্কৃতি মতে একটি শিশু তার পরিবার থেকে তার ‘সংস্কার’ অর্জন করে। যদি বিপথগামী কোনো ‘সংস্কার’ সে অর্জন করে, তবে তা পরে তার আচরণেও প্রতিফলিত হয়। সুতরাং, পরিবারের প্রবীণদের ছোটোদের প্রতি সঠিক ধরনের সংস্কার সঞ্চারের দায়িত্ব রয়েছে। পরে, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং, আজকের শিক্ষার্থীরা পরিবারে এবং স্কুলে যেভাবে শেখে সেভাবেই আচরণ করে থাকে। এটি সামাজিক অবক্ষয় এবং সাংস্কৃতিক ঘাটতিগুলির একটি— যা সমসাময়িক ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরগুলিতেও স্পষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রের চিত্রটি নানা ঐতিহাসিক কারণে সবচেয়ে শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গ দেশভাগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; বিভাজন-পূর্ব বাংলার ওপার থেকে অসহায় মানুষদের আকস্মিক আগমনের কারণেও এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজ্যকে সেই উদ্বাস্তু ভার বইতে হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে নকশাল আন্দোলনের প্রাদুর্ভাবের কারণেও রাজ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যা সর্বহারা বিপ্লবের পরিবর্তে রাজ্যটিকেই সর্বহারা শ্রেণিতে পরিণত করেছিল—কেননা এটি রাজনৈতিকভাবে কম অশান্ত ভারতের অন্যান্য অংশগুলিতে পুঁজি ও প্রতিভার চালানের পথ তৈরি করেছিল। রাজ্যটি তিন দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা বাম সরকারের উত্থান ও পতন দেখেছে। রাজ্যটি 'পরের ধনে পোদ্দারি' করার প্রবণতাগুলির উত্থান এবং তাদের প্রতিপত্তি দেখেছে। এটি পেশিশক্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বও দেখেছে, যার ধাক্কা প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ এলাকার লোকেদের উপর বর্তেছিল; এবং রাজ্যটি ২০১১ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন দেখেছে যা, চলতি কথায়, কেবল একটা জার্সির পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কারণ অতীতে যে ব্যবস্থাটি বিকাশ লাভ করেছিল তা, সম্ভবত আরও ভয়ংকরভাবে এইসময় থেকে প্রকট হয় স্থানীয় ভোট-কারবারি রাজনীতিকদের ক্ষমতার খেলায়। তাদের উপরতলার রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের জন্য তারা ভোট সংগ্রহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলত, পশ্চিমবঙ্গে শীর্ষ রাজনৈতিক কর্তাদের এবং তাদের স্থানীয় চেলাদের মধ্যে একটি ক্ষতিকর ব্যবস্থার প্রশ্রয় ও বোঝাপড়া ঘটতে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যপর্যায়ে প্রণীত নীতির নকশা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই চেলারা উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হয়ে থাকে যা রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তাদের দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি ও ভূমিকাকে অপরিহার্য করে তোলে।

আতঙ্কজনক আর্থ-সামাজিক দৃশ্যের এই বাস্তবতার কারণে এরাজ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান প্রায় শূন্য, যে কারণে লোকেরা সরকারি এবং অন্যান্য জায়গায় কাজের খোঁজে যেতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে অর্থ এবং অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে সরকারি সংস্থা এবং চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে তৈরি হয় একরকম মধ্যস্থতাকারী দালালচক্র যারা সরকারি এবং অন্যান্য সেক্টরে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতার সুবাদে স্থানীয় বাহুবলীদের অপকর্মের একটি পাকাপোক্ত ভিত তৈরি করতে সহায়তা করে। আরও অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সম্প্রতি (২০২২ সালে) কলকাতা হাইকোর্ট, এমনকি সফল চাকরি-প্রত্যাশীদের তালিকাও বাতিল এবং অকার্যকর ঘোষণা করেছে রাজ্যের এইজাতীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে! কলকাতা হাইকোর্ট যা দেখেছে তা হল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। হাইকোর্টও বুঝতে পেরেছে এই অসদাচরণগুলিই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এরাজ্যে। পুঁজির এবং প্রতিভার পলায়ন মানেই কি পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভবিষ্যৎ নেই? এর কোনো চূড়ান্ত উত্তর হতে পারে না যদিও এব্যাপারে আশাবাদী হওয়া খুবই মুশকিল।

তাহলে কীভাবে এই অবিরাম অধঃপতন ঠেকানো সম্ভব? না কি, বিশ্বভারতী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশ বিলুপ্তই হয়ে যাবে? আমাকে একটি গল্প আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে দিন যা আমি একজন শিক্ষাবিদের কাছ থেকে শুনেছি; যিনি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বভারতীর সেবা করেছেন। গল্পটি এইরকম: একদিন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনজন উপাচার্য ভগবান শিবের কাছে গিয়েছিলেন তাঁদের পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবিষ্যত জানতে। একজন পশ্চিম থেকে, আরেকজন সুদূর পূর্ব থেকে এবং আরেকজন বিশ্বভারতী থেকে। পশ্চিমের উপাচার্যকে ভগবান শিব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে তাঁর বেশিরভাগ সমস্যা পঁচিশ বছরের মধ্যে মিটে যাবে। সুদূর প্রাচ্য থেকে আসা উপাচার্যও হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন যেহেতু ভগবান শিব তাঁকে নিশ্চিত করেছিলেন যে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিশ বছরের মধ্যে সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। এখন বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পালা। তাঁকে দেখে ভগবান শিব কান্নাকাটি শুরু

করলেন কারণ তিনি নিজেই নিশ্চিত ছিলেন না যে বিশ্বভারতী অতীতে যে গৌরব অর্জন করেছিল তা আদৌ ফিরে পাবে কিনা! গল্পের মর্মার্থটি খুবই স্পষ্ট। বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ ভগবান শিবকে উদ্বিগ্ন করেছিল কারণ তিনি পশ্চিম ও দূর-প্রাচ্যের উপাচার্যদের মতো বিশ্বভারতীর কাম্য সুদিনের কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলতে অপারগ ছিলেন। গল্পটি একটু অতিরঞ্জিত হতে পারে কারণ বিশ্বভারতীর প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলি অনতিক্রম্য বলে মনে হয় না যদি প্রতিষ্ঠানটির অংশীদারেরা এর মহান প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে তাঁর বিদ্যার সৃষ্টি ও প্রসারের এই বৈশ্বিক বেদিটি যেভাবে শুরু হয়েছিল তা অবিচলিত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার করেন। এটা প্রমাণিত যে, বিশ্বভারতী বছরের পর বছর ধরে দলগত লক্ষ্য পূরণের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যা সাধারণভাবে এই ধারণার জন্ম দিয়েছে যে এখানে নিয়ম-নীতির কোনো বালাই নেই। এখানে ‘দাদাগিরি’ করে বা পেশি আস্ফালন করে সবকিছু করা যায়। আমি আমার পূর্বসূরিদের দোষ দিই না; তাঁদের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে বা সমস্যা এড়াতে বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে শান্তির জন্য নিয়ম ও বিধানকে লঘু করতে হয়তো তাঁদের বাধ্য হতে হয়েছিল। তবুও, আমি মনে করি আমার দায়িত্ব অপূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমি এই সত্যটিকে চিহ্নিত না করে দিই যে বিশ্বভারতীর একজন উপাচার্য এমন একজন অঙ্গীকারবদ্ধ প্রধান যিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েই সাধারণত কার্যভার গ্রহণ করে থাকেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করেই তাঁকে চলতে হবে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্বভারতীর প্রধানের পক্ষে এটির পরিচালনা করা বরং সহজ ছিল কারণ ১৯৫১ সালের ‘বিশ্বভারতী আইন’ অন্তত তখন বিদ্যমান ছিল না। এই আইনটি গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আর্থিক অনুদান পেতে শুরু করে যা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নিয়ম ও বিধানের কাঠামোর মধ্যে এমনভাবে বেঁধে রাখে, যার লঙ্ঘন একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে তার অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সুতরাং, উপাচার্য এবং সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তাদের নজরদারির অধীনে এসে গেছে। এটি একই সঙ্গে ভালো এবং খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকের জন্য এটি ভালো কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার ফলে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্মরতদের তুলনায় একটি ভালো বেতন প্যাকেজ নিশ্চিত করেছে; এবং এছাড়াও আছে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার নিয়মিত প্রাপ্তি যা রাজ্য-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁদের সমকক্ষদের জন্য আশা করা দুষ্কর। এটি আবার খারাপও কারণ, এখন, তাঁরা তাঁদের স্বাধীনতা হারিয়েছেন যা তাঁরা বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার আগে উপভোগ করতেন। স্পষ্টতই এটি তাঁদের জন্য এটি একটি ‘শাঁখের করাত’ দশা হয়ে উঠেছে। নিয়ম ও বিধানের উপর টানা বিধিনিষেধের দৃঢ়তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কঠোর হয়ে ওঠে যা অনেকের কাছে বিরক্তির কারণ নিশ্চয়ই; যদিও তাঁরা তাঁদের মাসিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁদের এই নিরুৎসাহ কখনোই প্রকাশ করেন না! সুতরাং, এই প্রবাদটি যথার্থ যে, ‘যতক্ষণ একটি ব্যবস্থা একজনকে অধিকার ভোগ করতে দেয়, একজন চাঁদের উপরে থাকে; কিন্তু যে মুহূর্তে একজনকে নিজের কর্তব্য মনে করিয়ে দেওয়া হয়, সে সবচেয়ে বিরক্তিকর দুরাত্মা হয়ে ওঠে’। প্রাক্তন উপাচার্যদের লিপিবদ্ধ স্মৃতিকথাগুলির পর্যালোচনা সন্দেহাতীতভাবে এই সত্যটি সুনিশ্চিত করে। যত দিন যাচ্ছে বিশ্বভারতীর পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে যাচ্ছে। তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে বিশ্বভারতীর উপর স্বার্থান্বেষী মহলের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা। অন্যকথায়, কর্তৃপক্ষ তাঁদের পক্ষপাতমূলক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাওয়া লোকেদের চাপের কাছে নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতী আইনের নির্দেশাবলি; এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মূল্যবোধ তৈরি করতে চেয়েছিলেন— এই দুই থেকেই বিচ্যুত হতে শুরু করে বিশ্বভারতী।

সংকট থেকে বেরোনোর উপায় কী?

কোনো উপাচার্যের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের মূল নীতিগুলিকে স্মরণে রেখে আমাদের দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বভারতীকে পুনরুজ্জীবিত করার উপায় ও তার পন্থা বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত, যাঁরা বিশ্বভারতীকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মহান আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁদের একত্রিত হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্বার্থান্বেষী স্বার্থের কারণে কাজটা সহজ নয়। কিংবা, নবকুমার বসুর জীবনীমূলক উপন্যাসটিতে যেমন চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে— ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে বিশ্বভারতীর যে অধঃপতনের শুরু তা রাতারাতি শোধারানো যাবে না। এটি অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়ায় সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও, কোনো সন্দেহ নেই, মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় যে-কোনো মহৎ কাজই সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা বিশ্বভারতীর অন্নজলে প্রতিপালিত তাঁদের মানসিকতারও পরিবর্তন দরকার। এটা আশ্চর্য বলে মনে হয় না যে স্থানীয় হোটেল মালিক, ছোটো দোকানদার, যাঁরা ই-রিক্সা চালান এবং আশপাশের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিশ্বভারতীর পৌষমেলা এবং বসন্ত-উৎসব আয়োজন করার জন্য জোর দিচ্ছেন, কারণ এই দুটি অনুষ্ঠান অনেক পর্যটককে আকৃষ্ট করে যার অর্থ হল যদি সেগুলোর আয়োজন না হয় তাহলে তাঁদের আয়ের একটি প্রধান উৎস বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, এই পার্বণগুলি আয়োজনের উপর যে বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হয় সে শুধুমাত্র তাঁদের স্বার্থ এবং একচেটিয়া মুনাফার কারণে! এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজনে বাইরে থেকে খুব কমই সাহায্য পাওয়া যায়, এর মূল দায় ও দায়িত্ব এসে পড়ে বিশ্বভারতীর উপর। এই দুটি অনুষ্ঠানে প্রতিদিন প্রায় দুই লাখের বেশি লোকের সমাগম ঘটে। বিশ্বভারতীর কাছে এত বিশাল জনসমাগম পরিচালনা করার মতো জনবল নেই বা এই পার্বণগুলিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মতো আর্থিক শক্তিও নেই। আমার কার্যকালে কিছু শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারি এবং কিছু উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা এগুলি আয়োজিত হয়েছিল। বসন্তোৎসবের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য যা এখন ‘বসন্ত তাণ্ডব’-এর পর্যায়ে চলে গেছে; যার অর্থ হল অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার মতো একজন সংবেদনশীল অংশগ্রহণকারী হওয়ার পরিবর্তে, এটি অনেকের কাছে ফূর্তি-ফার্তা করার উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৯ সালে স্পষ্ট দেখেছি; যেখানে সেবারের উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, অনুষ্ঠান শেষে আমাদের ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সেই আশ্রমমাঠের পাশের একটি ছাত্রীনিবাসে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর অনেক সাংবাদিক, বিশেষ করে মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা আমাদের জানিয়েছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন অংশ এবং তারও বাইরে থেকে অসংখ্য গাড়ি আসার কারণে গোটা বোলপুর অচল হয়ে পড়েছিল এবং পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল কারণ ভিড় সত্যিই ছিল অকল্পনীয়রকম বেশি। বস্তুত এত লোকের স্বচ্ছন্দ চলাচল পরিচালনা করার মতো পুলিশের পর্যাপ্ত বাহিনী ছিল না। শুধু আধমাইল পথ অতিক্রম করতে দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগছে বলে শুনতে পেয়েছিলাম সেদিন। বোলপুর এবং শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের কাছে এ ছিল এক দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা। ঘটনার পরের দিনের অভিজ্ঞতা ছিল আরও ভয়াবহ। আমরা অনুষ্ঠানস্থল থেকে অনেক ওয়াইন, বিয়ার, রাম এবং হুইস্কির বোতল এবং টন টন প্লাস্টিকের জলের পাউচ সাফ করলাম! যারা বিশ্বভারতীর খরচে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে তারা পৌষমেলা বা বসন্তোৎসবের পরে কখনো মাঠ পরিষ্কার করতে এগিয়ে আসে না, কারণ তারা শুধু উপভোগ করে কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করে না। তারা মনে করে, বিশ্বভারতীর কাজ হল এগুলির আয়োজন করা আর তাদের কাজ শুধু উপভোগ করা। যারা শুধু উপভোগ করতে আসে তারা আমাদের কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে শুধুই অধিকার দাবি করে। যাঁরা বাইরে

থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই জানেন না কবি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে সাড়া দিয়ে কীভাবে বসন্তোৎসবের পরিকল্পনা সংগঠিত করেছিলেন। এসব জানতে তাঁদের বয়েই গেছে! বহিরাগতদের জন্য এটি একটি বনভোজনের দিন। উৎসবের একদিন পরে যখন আমরা পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করি সেখানে তখন আমরা মাটিতে খাবারের দেদার উচ্ছিষ্ট পেয়েছি।

তৃতীয়ত, বিশ্বভারতী যে অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি নিয়মিত করে থাকে (বুধবারের উপাসনা, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, মাঘোৎসব, শিল্পোৎসব ইত্যাদি), সেগুলি পৌষমেলা বা বসন্তোৎসবের মতো আকর্ষণীয় নয়, কারণ সেগুলি এই দুটির মতো অর্থ-উপার্জনের মজাদার উত্স নয়। এখানে আমি অবশ্যই উল্লেখ করতে চাইব যে স্থানীয় কারিগরদের হাতে-তৈরি পণ্য বিক্রি করার জন্য পৌষমেলা শুরু হয়েছিল; যা এখন আর হয় না কারণ তারা খুব কমই ক্রেতা পায়। ফলে মেলায় বেশিরভাগ দোকানদারই দামি বাণিজ্যিক পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতারাও সেই দোকানগুলিতেই যায়। তাই, এখন, অনেক মৃতপ্রায় হস্তশিল্পকে সাহায্য করার পরিবর্তে পৌষমেলা দেশের অনেক অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ীদের সুবিধা করে দিয়েছে। অনলাইন বুকিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে স্টল বিতরণের প্রশ্নে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যাতে স্পষ্ট হয় যে এই দুর্নীতির সঙ্গে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত এমন অনেকেই জড়িত ছিল। পৌষমেলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এটা কোনো যুক্তি নয়। আমরা তা বলছিও না। আমাদের বক্তব্য হল, রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যকে প্রকৃত অর্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হলে উপরে উল্লিখিত বেনিয়ম ও অসামঞ্জস্যগুলিকে সমাধান করার জন্য আপনারাও সবাই দয়া করে এগিয়ে আসুন।

চতুর্থত, বিশ্বভারতীর বদনাম হয়েছিল কারণ অনেক শিক্ষক সপ্তাহে একবারমাত্র ক্যাম্পাসে উদয় হন বলে অভিযোগ শোনা যেত। শ্রীনিকেতন ক্যাম্পাসের একজন শিক্ষক আমাকে এই বিষয়ে একটি খুব মজার গল্প বলেছিলেন। তাঁর মতে, অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁরা কলকাতা থেকে খুব ভোরে কলকাতা থেকে আসা গৌড়বঙ্গ এক্সপ্রেস ধরে ক্যাম্পাসে এসে সকাল ৯টা থেকে ক্লাস নিয়ে দুপুর ১টা ১০-এর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরে আবার বাড়ি ফিরে যান! ক্লাসের সময়সূচি এভাবেই তাঁদের জন্য নির্ধারণ করা হত যাতে ১-১০-এ তাঁরা শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরতে পারেন। বোলপুর স্টেশনে যাওয়ার আগে, তাঁরা সবসময়ই মাছের স্থানীয় বিক্রেতা লাখপতির কাছ থেকে মাছ কিনতেন, কারণ লাখপতির মাছের বেশ খ্যাতি ছিল। আমি টাইম- টেবিল চেক করেছি এবং আশ্চর্য হয়ে দেখেছি কথাটা তেমন মিথ্যা নয়। আমি এও শুনেছিলাম যে এই যাত্রীরা সাধারণত শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ডি-২ বগিতে একসঙ্গে সফর করেন। উপাচার্য হিসেবে আমার কর্মকালের শুরুতে, আমি ট্রেনের ডি-২ বগিতে বসেছিলাম এটা সত্য কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য। আশ্চর্যজনক হলেও ঘটনা হল যে এটা মিথ্যা নয়! আমার চৌকিদারির সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতি অতীতের মতো আর তত গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না।

পঞ্চমত, অফিসে অনুপস্থিতি বা দেরিতে উপস্থিতি বিশ্বভারতীর স্থায়ী কর্মচারিদের কখনো আত্মগ্লানির কারণ হয়েছে বলে মনে হয়নি। প্রাথমিকভাবে, আমি জানতে পেরেছি যে অশিক্ষক কর্মচারিদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই এবং তাঁরা স্থানীয় রাজনৈতিক কর্তাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে এবাবদ প্রাপ্য শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমার নিয়মিত নজরদারিতে সমস্যাটি চূড়ান্তভাবে সমাধান করা গেছে বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম। কিছু পরে, আমাকে জানানো

হয়েছিল যে আগের অভ্যাসটি মনের আনন্দে আবার ফিরে এসেছে। সম্ভবত তাঁরা ভেবেছিলেন যে ওই কৌশলে আমার নজর এড়িয়ে যাওয়া যাবে! কী আশ্চর্যের বিষয় যে এই রোগটি অফিসার থেকে শুরু করে পিয়ন সকলকেই আক্রান্ত করেছে। আমি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যালয়সহ অফিসগুলিতে আকস্মিক পরিদর্শন করেছি এবং একটি নিয়ম তৈরি করেছি যে উপাচার্যের সচিবালয়ে রাখা উপস্থিতি রেজিস্টারে কর্মচারিদের উপস্থিতির স্বাক্ষর করতে হবে। আমার বিশ্বাস, এই রোগটি এতদিনে একটি উপযুক্ত ওষুধ পেয়েছে এবং অনুপস্থিতির সমস্যা এবং দেরিতে উপস্থিতি এখন অতীত বলে মনে হচ্ছে। আমি একটি তথ্য আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছি যা বিশ্বভারতীর একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং এখন বোলপুরের একটি স্কুলে কর্মরত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন। আমাকে ধন্যবাদ জানানোর পরে, তিনি জানান যে বোলপুরের দোকানদাররা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে কারণ টিফিন বক্সের বিক্রি দ্রুতগতিতে বেড়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে আমার আসার আগে, বিশ্বভারতীর কর্মচারিদের টিফিন বক্স সম্পর্কে ধারণা ছিল না কারণ তাঁরা এসে নিজের ইচ্ছায় অফিস ছেড়ে চলে যেতেন যখন-তখন। কাজেই তাঁরা নির্ধারিত নিয়মানুসারে আধঘন্টার মধ্যাহ্নভোজের বিরতি অনুসরণ করার প্রয়োজন অনুভব করতেন না। গল্পটি বলার উদ্দেশ্য হল এই বিষয়টি বোঝানো যে অশিক্ষক কর্মীদের তাঁদের উপস্থিতির প্রশ্নে সময়নিষ্ঠ হতে হবে এবং তাঁদের নির্ধারিত কাজগুলি শেষ করতে সদাপ্রস্তুত থাকতে হবে। অফিসারদের উদাহরণও দেওয়া হল, যার অর্থ হচ্ছে সময়মতো অফিসে এসে তাঁরাও সরকারি বিধি মোতাবেক কাজকর্ম করবেন।

পরিশেষে একটা অপ্রীতিকর কথা হল, এমন উপায় প্রয়োগ করে কর্তব্যকর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা অসম্ভব না হলেও সুখকর নয়। প্রতিশ্রুতি সহজাতভাবে নিজের ভিতর থেকে আসা উচিত। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে তাঁরা বিশ্বভারতীর জন্য তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী কাজ করে করদাতাদের অর্থ থেকে নিয়মিতভাবে সুন্দর বেতন পেয়ে থাকেন। বেসরকারি সেক্টরে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতদের তুলনায় বিশ্বভারতীর কর্মচারিরা সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্তির দিক থেকেও ভালো অবস্থানে রয়েছেন। আমরা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করি না; আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে দৈনিক শ্রম দিই তার জন্য আমরা বেতন পাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমাদের অঙ্গীকারের প্রতি নৈতিকভাবে সংবেদনশীল থাকতেই হবে। উপাচার্য, কর্মসচিব, অধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধান এবং অন্যান্য পদাধিকারীসহ তাঁর সহকর্মী বা প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অধিকার কারোর নেই। এমন ব্যবহার আমাদের নৈতিক দেউলিয়াপনা প্রমাণ করে। কর্তৃপক্ষের অপসারণ কি চূড়ান্তভাবে বিশ্বভারতীর সংকট ও উদ্বেগের কারণগুলি নিরসন করবে? যদি তাই হয়, নতুন উপাচার্যের আগমন এবং প্রশাসকদের একটি নতুন দলগঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভারতীর স্বঘোষিত অভিভাবকদের তৈরি করা জটপাকানো সমস্যাগুলি অবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি বেশিরভাগ ছাত্র, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের এইধরনের আচরণের ও উদ্গীরণের মুখ্য কারণগুলি বুঝতে পেরেছি যা ঠিক মহৎ কারণ নয়। যাঁরা বিশ্বভারতী থেকে নিয়মিত আয় করেন তাঁদের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মপর্যালোচনার প্রয়োজন কারণ বিশ্বভারতী হল সেই প্রবাদপ্রতিম হংস যা নিয়মিত বিরতিতে সোনার ডিম্ব দেয়! হাঁসটিকে যত্ন, পরিচর্যা এবং সহানুভূতির সঙ্গে লালনপালন করা দরকার। যদি আমরা তার থেকে বিচ্যুত হই, তাহলে আমরা যাঁরা এর অর্থে জীবনের বস্তুসুখ অর্জন করেছি তাঁদের পক্ষে হয়তো তা একটি হারাকিরি হয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের কবর খনন করার পরিবর্তে, আসুন স্বার্থপরের মতো স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে নয়; বরং বিশ্বভারতীর জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে, একটি সমাধানে পৌঁছানোর জন্য একযোগে

চিন্তাভাবনা করি। এটাই এখন আমাদের সামনে একমাত্র কাজ। অন্যথায়, বিশ্বভারতীর ভাবাদর্শগত ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এবং রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের প্রকৃত রক্ষক হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে না পারার কারণে ইতিহাসের কাঠগড়ায় আমরা খলনায়ক হিসেবে পরিগণিত হব।

এই বার্তালাপটির উদ্দেশ্য হল, বিশ্বভারতীর জন্য যাঁরা কাজ করেছেন এবং যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁদের অবদানকে অবমূল্যায়ন করা বা হেয় করা নয়; বরং বাংলার প্রচলিত প্রবাদের সেই উপদেশকে আরেকবার স্মরণ করা: "দশে মিলে করি কাজ/ হারি জিতি নাহি লাজ।' এটি একটি ইংরেজি প্রবাদের প্রতিধ্বনি: "United We Win, Divided We Fall" I গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের মূল কথা যে তিনি সারাজীবন প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করেছিলেন। আসুন আমরা ফিনিক্সের মতো জেগে উঠি যা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার আশীর্বাদে অসম্ভব নয়।